রেজাউল করিম

মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানপতন

১

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

ভূমিকা

মহান মোগল শাসকদের সম্বন্ধে সাধারণ ইতিহাস লেখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তাঁদের সম্বন্ধে প্রকাশিত অসংখ্য যোগ্যতাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং তাঁদের রাজত্বকালের অন্য কয়েকটি বা অন্য কিছু সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপুলসংখ্যক রচনার আলোকে এসবের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলোকে একটি সাধারণ ইতিহাসের আকারে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মোগলদের সাধারণ ইতিহাস সম্বন্ধে বহুসংখ্যক রচনা মুদ্রিত হয়ে আসছে। এ ধরনের সাধারণ ইতিহাস স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাঠক্রমের চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের জন্য সাধারণত লিখিত হওয়ায় সেগুলো অপরিহার্য বা আত্মগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে। তাই এ ধরনের রচনার লেখকরা ছাত্রদের বা তাঁদের নিজেদের স্বার্থে বর্তমান জনপ্রিয় অভিমতগুলোকে অতিক্রম করে যাওয়া বাঞ্ছনীয় ও নিরাপদ বলে বিবেচনা করেননি। বর্তমানের এই রচনাটির উদ্দেশ্য আরেকটি পাঠ্যবই প্রকাশ করা নয়; কিন্তু এর উদ্দেশ্য সর্বশেষ অধ্যয়ন ও গবেষণার আলোকে মোগলদের সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য তাঁদের ইতিহাস পুনরায় বর্ণনা করা। এতে অন্যান্য ঐতিহাসিক মতামতের কৌশলী গ্রন্থনা বলে দাবি করা যায় না; যদিও সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব ও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানপতন গ্রন্থটি দুটি ভলিউমে প্রকাশ হয়েছে। এতে মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা এবং আধুনিক লেখকদের রচনাগুলো অধ্যয়নের ফলাফলকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতের ভিত্তিতে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকের গবেষকরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতামতের সাথে স্বাধীনভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করে থাকবেন শুধু যখন মোগল ইতিহাসের মূল উৎসগুলো সম্বন্ধে লিখিত ধারণাগুলো অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে। কতকগুলো প্রবন্ধ অপ্রচলিত অবস্থায়

রয়েছে এবং সেগুলোর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিসরের সীমাবদ্ধতা ও বিষয়গত ব্যাপকতা বিশিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির কোনো বইয়ে স্পষ্টত বিস্তারিত যুক্তি, সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি বা মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতামত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝে জটিল কারণে এমনকি সমসাময়িক লেখকদের মতামতের ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত বড় ধরনের কাজ এবং এজন্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাউকে বাবরের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার বা রাজপ্রতিনিধিত্ব থেকে বৈরাম খানের অপসারণের পরে তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে খলিফার মনোভাব সম্পর্কে উল্লেখ করতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ওই সব বিষয়ে কয়েকশ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে এবং আরও লেখা যেতে পারে। এ ধরনের আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাময়িকী বা প্রবন্ধের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। সেগুলো বিষয়ের বর্ণনাকে সমানুপাতিক ভারসাম্যহীনভাবে, গ্রন্থটিকে খুব বেশি বড় ও পড়ার প্রায় অনুপযুক্ত না করে কোনো সাধারণ রচনাতে কদাচিৎ স্থান দেওয়া যেতে পারে। প্রথম বড় ধরনের রচনা হিসেবে এটাকে পাঁচশ পৃষ্ঠার মধ্যে ধারণ করা হয়েছে। আরও একটি রচনা। সেটি উপর্যুক্ত ভলিউমের ধারাবাহিক আলোচনা দ্বিতীয় ভলিউমে প্রকাশ হয়েছে। যদি এ ধরনের অনেক বিতর্কিত বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হয় এবং সংক্ষেপে এগুলো সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় তবে পূর্ণতর তথ্যসন্ধানী ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল উৎসগুলোর খোঁজ করবেন। ব্যাপক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এই গ্রন্থের লেখক সেগুলোর ভিত্তিতে মন্তব্য পেশ করেছেন এবং তাঁর দায়িত্ব সততার সাথে পালনের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর দক্ষতাকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছেন। তিনি কোনো বিষয়ে শেষ কথা বলারও দাবি করেননি এবং কেউ তা করতে পারেন না। কিন্তু তিনি প্রাপ্ত প্রমাণকে যথাসম্ভব সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে পরীক্ষা করার দাবি করেন। তাই তিনি সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞদের এবং নির্দিষ্টভাবে মূল উৎসগুলো সম্বন্ধে অভিনিবেশপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার পরে তাঁর বর্ণনা বিচার করার জন্য পাঠক ও পণ্ডিতদের আসক্তি আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

একজন সাধারণ ও নৈমিত্তিক পাঠকের পক্ষে ইতিহাসটি বিষয়ভিত্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে কিনা তা অনুসরণ করা সহজতর হবে। কিন্তু এ ধরনের পরিকল্পনাতে পুনঃপুন পরস্পরবিরোধী প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি ও পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হবে এবং তা ছাড়া ঐতিহাসিক দৃশ্যপট ও ক্রমবিকাশ সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না। মোটকথা, ঘটনাবলির বিবর্তনের ধারা, সার্বিক ও অবস্থাগত গুরুত্ব ব্যাপকভাবে ব্যক্তির মনোভাব, চরিত্র ও কর্মপন্থা, আন্দোলন ও জনসাধারণ সম্পর্কে ধারণা দেয়। ঐতিহাসিক গঠনরীতি ও উপস্থাপনাকে একেবারে বিনষ্ট না করে হলেও নির্দিষ্ট রং ও গুণাবলির সুতাকে টেনে বের করে নেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নিবিড়ভাবে বোনানো হয়েছে

যে, তার উপর্যুক্ত তাৎপর্য শুধু তাদের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সরলতার মধ্যে নয়, বরং তাদের নানাবিধ জটিলতার মধ্যে বুঝতে পারা যায়। তাই এই পুস্তকের লেখক চেষ্টা করেছেন দুটি চরমপন্থার মধ্যে মধ্যস্থতা অনুসরণ করতে। কারণ অন্যথায় এই গ্রন্থটি বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধের সংগ্রহ বা শুধু ঘটনাবলিতে পরিণত হতো। এই সব কারণে সঠিক অনুধাবনের স্বার্থে যতটা সম্ভব ঘটনার বিবর্তন ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। বর্ণনাটিকে কিছুটা ভারী ও নিরুত্তাপ করার ঝুঁকিতে কিন্তু নিখুঁত ও সত্যরূপে প্রকাশের স্বার্থে এর সাথে জড়িত রূপক অলংকার যুক্ত বা বর্ণোজ্জ্বল বা বিদ্রুপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অবস্থার সন্দেহপূর্ণ তুলনা পরিত্যাগ করা হয়েছে। আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য, উক্তি ও ভাবাবেগপূর্ণ মানসিকতাকে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা বর্জন করা হয়েছে। লেখক বিশ্বাস করেন যে নিখুঁত বর্ণনাই ইতিহাসের নির্যাস এবং তা সরাসরিভাবে পুরুষোচিত ও পরিচ্ছন্ন রচনারীতিতে অবিমিশ্র ও বাহ্যিক চাকচিক্যহীনভাবে ঘটনাগুলোর বিবরণ পেশ করে। সমন্বয় সাধন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘাত, ব্যক্তি, আন্দোলন ও জনগোষ্ঠীগুলোর পুনঃঅভ্যুত্থান বা অবনতি এবং পরিবর্তনশীল অবস্থা ও আদর্শের মধ্যে ইতিহাসের আকর্ষণ ও রোমাঞ্চ নিহিত থাকে। ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিগ্রাহ্য চরিত্র ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতাই প্রয়োজনীয় ভীতি, রোমাঞ্চ, অনুভূতির কম্পন ও কল্পনার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ ও আন্দোলনগুলোর ওপর রং লাগানোর জন্য যতদূর সম্ভব মানবিকভাবে কোনো ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, বাণিজ্যিক, জাতিগত বা প্রাদেশিক মানসিকতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। এখানে ইতিহাসকে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশকে ভারতে সংঘটিত জটিল, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

যদিও প্রত্যেকটি ঘটনা বা বাস্তব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তবু কোনো একভাবে বা অন্যভাবে এর প্রাসঙ্গিকতা বা মূল্য বিবেচনাধীন সুনির্দিষ্ট সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। লেখক বিবেচনাধীন বিষয়ের সাথে খুব বেশি মাত্রায় প্রাসঙ্গিক নয় এমন বাস্তব বিষয় বা ঘটনাবলি পরিত্যাগ করেছেন। যেসব বিষয় ও বাস্তব ঘটনাকে তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে ভেবেছেন শুধু এমন বিষয়গুলোকে তিনি বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। যদি তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে থাকেন তবে সে বিষয়টির প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন। মোটকথা ইতিহাসের প্রতিটি দায়িত্বশীল ছাত্রছাত্রীর লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থাতে যতটা সম্ভব সত্যকে আবিষ্কার করা। এই কাজে যে কোনো মহল থেকেই সহযোগিতা ও গঠনমূলক সাহায্য আসুক না কেন তা অভিনন্দিত হবে। উল্লিখিত সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে স্বল্প। পর্তুগিজরা প্রাদেশিক

শাসনকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরে ভারতে এসেছিল এবং তারা মাঝে মাঝে আন্তরিক বলে উপলব্ধি করেছে কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে মোগলদের সাথে তাদের মেলামেশাটা ছিল নৈমিত্তিক, আনুষঙ্গিক নয়। যাই হোক, তাদের ইতিহাস যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন অন্যথায় তা মোগল ইতিহাসের প্রধান স্রোতধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতো না। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বাস্তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-চতুর্থাংশ পর্যন্ত তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

মোগল শাসনকর্তাদের সাধারণ ইতিহাসে উক্ত সময়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। প্রসঙ্গের উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আধুনিক রচনাগুলো সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা গবেষণা করতে ইচ্ছা করেন তাঁরা সম্রাটদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত গ্রন্থতালিকা বা সেই সময়ের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক এবং নির্দিষ্টভাবে সি. এ. স্টোরি (লুজাক ও কোম্পানি) কর্তৃক রচিত পারস্য সাহিত্য দ্বিতীয় শ্রেণির ঐতিহাসিক উৎসগুলো বিষয়ক বিভিন্ন তালিকায় দেখতে পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ ছাড়াও প্রত্যেকটি শাসন আমলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে।

কোনো কোনো সময়ে বিভ্রান্তি হলেও পারস্য ভাষায় রচিত সরকারি ইতিহাসের তারিখ গণনা কয়েকজন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধে ইচ্ছামাফিক সমন্বয় সাধনের কারণে এবং চন্দ্র বছর সৌর বছরের তুলনায় এগারো দিন ছোট হওয়ায় তা সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য। বেসরকারি পারস্য ইতিহাসের তারিখ গণনা ততটা নির্ভরযোগ্য নয় এবং মারাঠা ও শিখ ইতিহাস আরও কম নির্ভরযোগ্য। যা হোক, এই গ্রন্থকার সুপরিচিত লেখকদের রচনা থেকে যা কিছু সংগ্রহ করা যায় তা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং তিনি আশা করেন যে, একজন সাধারণ পাঠক বা ছাত্রদের বাস্তব উদ্দেশ্যে তারিখ গণনার সারণিগুলো সম্পূর্ণ কার্যোপযোগী হবে।

নানাবিধ কর্তব্যের কারণে লেখক গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য যথেষ্ট অবসর পাননি। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁদের নিষ্ঠা এবং মুদ্রণকর্মীদের ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা উদ্যমী প্রকাশককে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। লেখক তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। সুতরাং ঘটনাবলির নির্ভুলতা, ব্যাখ্যা এবং তারিখ গণনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থকারের।

আর. পি. ত্রিপাঠী

সূচি

প্রথম অধ্যায় ॥ সম্রাট বাবর ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ লোদি সাম্রাজ্য ৩৬
তৃতীয় অধ্যায় ॥ সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩১-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ৮৩
চতুর্থ অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য ১০৮
পঞ্চম অধ্যায় ॥ শের শাহ শূর ১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ইসলাম শাহ ১৫৮
সপ্তম অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ১৭২
অষ্টম অধ্যায় ॥ মহান আকবরও অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপদে অভিষিক্ত ১৮৫
নবম অধ্যায় ॥ অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে আকবরের দ্বন্দ্ব ১৯৭
দশম অধ্যায় ॥ আকবরের বিজয়সমূহ : মেওয়ার ও মালওয়া ২১৬
একাদশ অধ্যায় ॥ মেবারের রানা প্রতাপ ২৩৪
দ্বাদশ অধ্যায় ॥ আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সংহত করেন ২৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ আকবরের বিজয় ২৭৬
চতুর্দশ অধ্যায় ॥ আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার ৩০৮
পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি ৩২৯
ষোড়শ অধ্যায় ॥ সম্রাট জাহাঙ্গীর ৩৬৩
সপ্তদশ অধ্যায় ॥ শান্তিস্থাপন : সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যাগুলো ৩৯৯
পরবর্তীকালের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি
অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ সাম্রাজ্যে শাহজাহান ও মহব্বত খানের বিদ্রোহ ৪১৫
ঊনবিংশ অধ্যায় ॥ শাহজাহান—দ্বিতীয় বুন্দেলা যুদ্ধ ও সিংহাসন লাভ ৪৩৬
বিংশতম অধ্যায় ॥ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ও পরবর্তী ধাপ ৪৬৮
একবিংশ অধ্যায় ॥ উত্তরাধিকার যুদ্ধ ৪৯৮

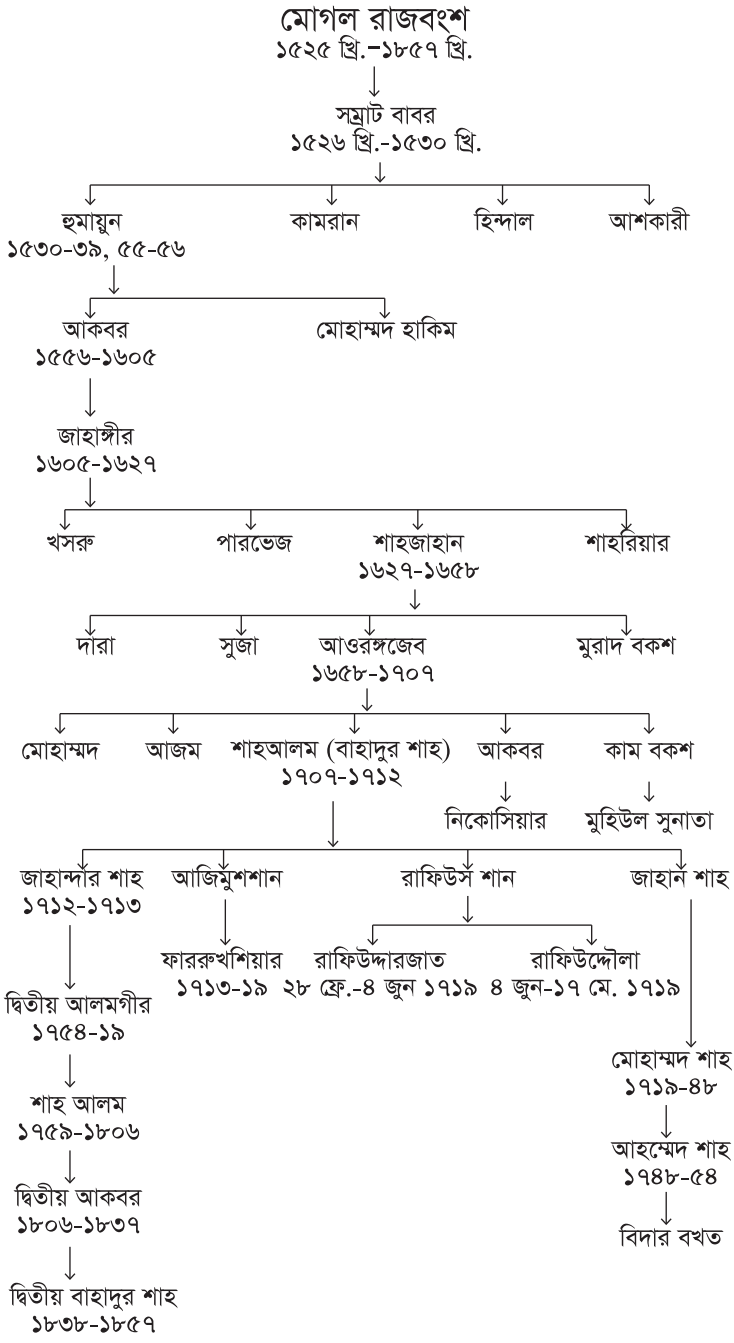
মোগল রাজবংশ
১৫২৫ খ্রি.–১৮৫৭ খ্রি.
সম্রাট বাবর
১৫২৬ খ্রি.-১৫৩০ খ্রি.
হুমায়ুন
১৫৩০-৩৯, ৫৫-৫৬
কামরান
হিন্দাল
আশকারী
আকবর
১৫৫৬-১৬০৫
মোহাম্মদ হাকিম
জাহাঙ্গীর
১৬০৫-১৬২৭
খসরু
পারভেজ
শাহজাহান
১৬২৭-১৬৫৮
শাহরিয়ার
দারা
সুজা
আওরঙ্গজেব
১৬৫৮-১৭০৭
মুরাদ বকশ
মোহাম্মদ
আজম
শাহআলম (বাহাদুর শাহ)
১৭০৭-১৭১২
আকবর
কাম বকশ
নিকোসিয়ার
মুহিউল সুনাতা
জাহান্দার শাহ
১৭১২-১৭১৩
আজিমুশশান
রাফিউস শান
জাহান শাহ
দ্বিতীয় আলমগীর
১৭৫৪-১৯
ফাররুখশিয়ার
১৭১৩-১৯
রাফিউদ্দারজাত
২৮ ফ্রে.-৪ জুন ১৭১৯
রাফিউদ্দৌলা
৪ জুন-১৭ মে. ১৭১৯
মোহাম্মদ শাহ
১৭১৯-৪৮
শাহ আলম
১৭৫৯-১৮০৬
আহম্মেদ শাহ
১৭৪৮-৫৪
দ্বিতীয় আকবর
১৮০৬-১৮৩৭
বিদার বখত
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
১৮৩৮-১৮৫৭

প্রথম অধ্যায়

সম্রাট বাবর

তৈমুরের বংশধর যাঁরা ভারত শাসন করেছিলেন তাঁরা নিজেদের চাগতাই তুর্কি বলে অভিহিত করতেন এবং মোগল বা মোঙ্গলীয়দের অর্ধবর্বর বলে অবজ্ঞা করতেন। তথাপি তাঁরা চেঙ্গিস খানের বংশধররূপে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন এবং পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিচিহ্নিত জীবন, কর্ম ও আইন থেকে বিরামহীনভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। বর্তমান কালের পরিচয় হিসেবে তৈমুর ছিলেন শহর-ই-সাবজ নামে পরিচিত কনিশের একজন তুর্কিপ্রধান আমির তুরাঘে বার্লাসের পুত্র। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি নিজেকে কার্যত চাগতাই খানের বংশধরদের দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডের অধিপতিতে পরিণত করেন। চাগতাই খানের বাসভবনের সাথে যুক্ত তুর্কিরা নিজেদের চাগতাই বলে অভিহিত করত। ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর পূর্ব তুর্কিস্তানের মোঙ্গলীয় শাসনকর্তা ও চেঙ্গিস খানের বংশধর ইলিয়াস খাজা খানকে পরাজিত করেন। তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানার শাসনকর্তার নাতনিকে বিয়ে করেন এবং শ্যালক আমির হোসেনের মৃত্যুর পরে চেঙ্গিস খানের পরিবারভুক্ত দিলশাদ আগাকে বিয়ে করেন। এভাবে তৈমুর শুধু ট্রান্সঅক্সিয়ানারই শাসনকর্তা নন আইনত অন্য শাসনকর্তার সাথেও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তা ছাড়া এটাও আবিষ্কৃত হয় যে, চেঙ্গিস খানের মতো তৈমুরও ছিলেন কাজুলি খানের বংশধর এবং তিনি ছিলেন রাজকীয় মোগল জাতিভুক্ত। এসব মর্যাদা ও ক্ষমতাসহ তৈমুর আইনত সার্বভৌম চেঙ্গিস খানের পারিবারিক মহলের একজন সুলতান শায়ুরহাতমিশের পক্ষে আমির হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পছন্দ করতেন।

তৈমুর ভলগার নিম্নভাগ থেকে যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলকে নিয়ে এবং এশিয়া মাইনর, পারস্য ও আফগানিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়া ছিল তাঁর স্বদেশভূমি এবং সমরখন্দ ছিল

মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় শাসনকর্তা তৈমুর লং (১৩৩৬-১৪০৫)

তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী। তিনি শুধু একজন মহান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, শিল্পকলা, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক ধারণার সাথে চেঙ্গিস খানের রাজনৈতিক ও সামরিক ধারণার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। চেঙ্গিস খানের আইন-কানুনের প্রতি তাঁর এত গভীর অনুরাগ ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে এমনকি কোরানকে দ্বিতীয় পর্যায়ে অবনত করার অভিযোগ উঠেছিল।[১] তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে চেঙ্গিস খানের প্রতিমূর্তি বলে গণ্য হতো। তাঁর মতো তাঁর বংশধররাও মধ্য-এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করা অব্যাহত রাখেন। ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরের মৃত্যুর পরে তাঁর সাম্রাজ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় একটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাতি পির মোহাম্মদ যাঁকে তৈমুর ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে সাম্রাজ্য দান করেন ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর দ্বিতীয় দৌহিত্র সুলতান খলিল যিনি সমরখন্দের দখল নিয়েছিলেন, তিনি এত বেশি অমিতব্যয়ী ও চিন্তাশূন্য ছিলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই সাম্রাজ্য হারান এবং ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি খোরাসানে মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর সমরখন্দসহ সাম্রাজ্যের শাসনভার চলে যায় শাহরুখ মির্জার অধীনে এবং তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানাতে আইনশৃঙ্খলা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সফল হন। তিনি নিজে হেরাটে অবস্থান করাকে শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন এবং তাঁর পুত্র উলুঘ বেগ মির্জাকে তাঁর নামে সমরখন্দ থেকে শাসনকার্য পরিচালনার ভার দেন।

উলুঘ বেগ ছিলেন বিশেষ করে বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক এবং দীর্ঘ শাসন আমলে সমরখন্দ এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর শহরে পরিণত হয়। ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাহরুখ মির্জা মৃত্যুবরণ করেন এবং সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হন উলুঘ বেগ মির্জা। যাই হোক, দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা উপভোগ করার ভাগ্য তাঁর হয়নি। তাঁর পুত্র আবদুল লতিফ বিদ্রোহ করে তাঁকে পরাজিত করেন এবং ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই কাপুরুষোচিত ও জঘন্য কাজের জন্য উলুঘ বেগের এক ভক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

নির্মম যোদ্ধা চেঙ্গিস খান (১১৬২-১২২৭)

মিরান শাহের পৌত্র আবু সাঈদ মির্জা যাঁর প্রতি তাঁর চাচা উলুঘ বেগ মির্জা পরম দয়াশীল ও স্নেহশীল ছিলেন তিনি সমরখন্দের সিংহাসন দাবি করেন। তিনি উজবেকপ্রধান আবুল খায়ের খানের সাহায্য কামনা করেন। আবুল খায়ের খান ট্রান্সঅক্সিয়ানা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সমরখন্দ দখল করার ভয় দেখান। অনেক অসুবিধার মধ্যে তাঁকে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয় এবং তার আগে আবু সাঈদ ট্রান্সঅক্সিয়ানা, উত্তর পারস্য ও আফগানিস্তানসহ মাকরান পর্যন্ত তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হননি।

উজবেক ও মোঙ্গলীয়দের সাথে আবু সাঈদ মির্জার সুসম্পর্ক ছিল না। তাঁর পিতামহ উলুঘ বেগ মোঙ্গলীয়দের বিখ্যাত খানসাহেব সুলতান ওয়েসের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং কাশগড় দখল করেন।[২] অন্য একসময় তিনি সুলতান ওয়েসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউনুস খানকে আশ্রয় দেওয়ার ভান করে তাঁর অধিকাংশ অনুগামীকে হত্যা করেন এবং তাঁকে বন্দি হিসেবে তাঁর পিতা শাহরুখ মির্জার কাছে পাঠান। উলুঘ বেগ মির্জার হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী বিভ্রান্তিকালে বিখ্যাত মোঙ্গল খান, ইশান বুঘা খান ট্রান্সঅক্সিয়ানা আক্রমণ করেন। তিনি অবাধে লুণ্ঠন করেন এবং তাসখন্দ ও জাকসার টেক্সের উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ডগুলো জয় করেন। তারপর আবু সাঈদ মির্জা ইউনুস খানের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাঁকে মোগলিস্তানে তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করেন। ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে বুঘা খান ইন্তেকাল করেন এবং মোঙ্গলীয়রা ইউনুস খানকে মহান খানসাহেব হিসেবে অভিনন্দিত করেন (১৪৬৫-৬৬)।

উজবেকিস্তানের শাসনকর্তা উলুঘ বেগ (১৩৯৪-১৪৪৯)

মোঙ্গলীয়রা শুধু তৈমুরের বংশধরদের অপছন্দই করত না, তাদের মনেপ্রাণে ঘৃণাও করত। তারা তৈমুরের বংশধরদের তাদের গৃহীত অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করত এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা উসকে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করত। যা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তিক্ততা সৃষ্টি করত তা হলো আবু সাঈদ মির্জা কর্তৃক স্থূলবুদ্ধিতে তৈমুর ও চাগতাই খানের স্বীকৃতি দেওয়া পরিবারভুক্ত বংশধরদের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য এবং তাঁর রাজকীয় কল্পনা। তিনি ইউনুস খানকে তাঁর একজন করে কন্যাকে তাঁর তিন পুত্রের প্রত্যেককে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেছিলেন। এই ঘটনা মোঙ্গলীয়দের মধ্যে ঈর্ষা জাগায় ও ভবিষ্যৎ সমস্যার বীজ এখানেই বপন করা ছিল।

তৈমুরের বংশধরদের মতো উজবেকদের সাথেও খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না। চেঙ্গিস খানের পুত্র বাটু তুর্কি ও মোঙ্গলীয়দের নিয়ে গঠিত এই অনমনীয় লোকজনের আরাল সাগরের পূর্ব ও উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ দাস্তি কিপচাপ নামক বৃক্ষহীন প্রান্তরে গতিরোধ করেন। জুজির পঞ্চম পুত্র সায়বানি খান তাদের পরিচালনা করতেন। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে উজবেক খান নামক বাটুর একজন উত্তরাধিকারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যেসব সায়বানি উজবেক খানের নেতৃত্বকে স্বীকার করেছিলেন তারা উজবেক নামে পরিচিত হয়। তৈমুরের কৌশল উজবেকদের মধ্যে আত্মকলহের বীজ বপন করে এবং তাদের একতাবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। যাই হোক, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তারা সায়বানি খানের বংশধর আবুল খায়ের খানের নেতৃত্বে একটি সংঘে ঐক্যবদ্ধ হয়।

উলুঘ বেগ মির্জার মৃত্যুর পরে তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। আবু সাঈদ মির্জা আবুল খায়েরের সাহায্য প্রার্থনা করেন যিনি তুর্কিস্তান ও খাওয়ারিজমের অংশবিশেষ আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মির্জাকে সমরখন্দের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে করেন। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর কয়েকজন পুত্রসহ একদল অসন্তুষ্ট সর্দারের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর